

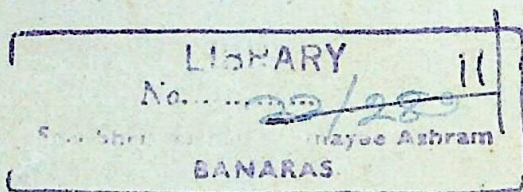
11/243
PRESENTED

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসর

প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে গৃহীত

কল্লেকটী গ্রন্থের

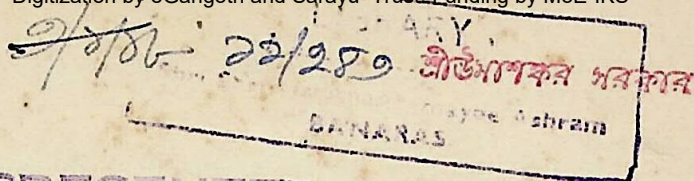
সমালোচনা



মাঘ ১৩৬২

শ্রীশ্রুত চক্রবর্তী

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাবলিকেশন্স
কমিটী, ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক সম্পাদিত
ও প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।



PRESENTED

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে
গৃহীত কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা।

পরমহংস রামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে যাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই সময় হইতেই একত্রে অবস্থান পূর্বক সাধন ভজন করিবার জ্ঞাত সংঘ গঠন করেন। অবশ্য “রামকৃষ্ণ মিশন” তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় কোনরূপ সংঘ ছিল না, কারণ তিনি কোনরূপ দল গঠনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকে কাহাকেও সাধন ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেও তিনি কাহাকেও তাঁহার শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এ বিষয়ে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় প্রমথলাল সেন এবং পরমহংসদেবের গৃহী-শিষ্য বলিয়া পরিচিত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নিম্নলিখিত সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন :—

“So long as we knew him during Keshab's life-time—the Dakshineswar Saint, we never knew that he was anxious for disciples, that he had a message etc.” (Diary, 10th December, 1929).

“ডাক্তার—সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহস্রে ডাক্তারের প্রতি)—আমার কোনো শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১ম ভাগ ; ১৬শ সংস্করণ ; পৃঃ ৩০০)

(২)

“কথামতে” প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী পরমহংসদেব এ কথা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিয়াছিলেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর। হুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরও তিনি কাহাকেও তাঁহার শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্তৃক পরমহংসদেবের কথা বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হওয়ার ফলে তৎকালীন খ্যাতিনামা ও অখ্যাতিনামা কত ব্যক্তিই তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মাত্র দ্বাদশজন যুবক তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া সংঘ গঠন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য :—

“যখন মদীয় আচার্য্যদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক ছিলাম—দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি উৎসবে একশত ব্যক্তি আমি একত্রিত করিতে পারি নাই।—”

(‘পত্রাবলী’ ১ম ভাগ, ১৩৫৫, পৃ: ৪৩৬)

উক্ত দ্বাদশজন যুবক যাহারা পরবর্ত্তীকালে পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পরমহংসদেবের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন :—

“পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্র নাথ—২য় সংস্করণ ; পৃ: ২৫৫)

গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরমহংসদেবকে ১৮৮০-১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

PRESENTED

(৩)

22/280

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কেহই তাঁহার সহিত বনিষ্ঠ ভাবে মেলাগেশা করেন নাই। কাজেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত পরমহংসদেবের যে বনিষ্ঠ ও নিগূঢ় সদ্ভক্তি ছিল সে বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্যই পরমহংসদেবের তিরোধানের বহুকাল পরে যখন তাঁহারা পুস্তকাদি মারফৎ তাঁহাকে স্বরং ঈশ্বর বা ঈশ্বরানুভাব বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন স্বভাবতই আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেবের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কাল্পনিক ও পরস্পর বিরোধী তথ্যাদি তাঁহাদের প্রচারিত গ্রন্থাদির মধ্যে স্থান লাভ করিতে লাগিল।

বর্তমানে পরমহংসদেবের গৃহী-শিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” (কয়েক খণ্ডে বিভক্ত) ও সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী সারদানন্দ প্রণীত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” (ইহাও কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত) এই গ্রন্থদ্বয়ই তাঁহার প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে সুপরিচিত ও প্রচলিত। “রামকৃষ্ণ সংঘ” ভুক্ত নহেন এমন যাহারা পরমহংসদেবের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাও এই গ্রন্থদ্বয়কেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু কেহ কি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির কঠিণাথরে বাচাই করিয়া দেখিয়াছেন যে উক্ত পুস্তকদ্বয়ে পরমহংস ও সমসাময়িক অগ্রাগ্র মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য কতটা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে?

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে “কথামৃত” প্রণেতা শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয়) সর্বপ্রথম পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার পূর্ব পর্য্যন্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেবের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহারও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। শ্রীম পরমহংসদেবকে ঈশ্বরানুভাব বলিয়া মনে করিতেন। “কথামৃতে”র

উপকরণ তিনি তাঁহার নিজস্ব “দৈনন্দিন লিপি” হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত যে তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবাবেগে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা শ্রীম মহাশয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জগুই তিনি প্রথমে ইহা মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই, নিজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন :—

গিরিশ—ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয় কি নাকি লিখেছ ?

শ্রীম—কে বলে ?

গিরিশ—আমি শুনেছি। আগায় দেবে ?

শ্রীম—না, আমি নিজে না বুঝে কাহাকেও দেবো না—ও আমি নিজের জগু লিখেছি ; অগের জগু নয়। (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ২য় ভাগ ; ৯ম সংস্করণ ; পৃঃ ২৮৩)

মহেন্দ্রাবু, শ্রীগিরীশচন্দ্র বোষ মহাশয়কে একথা বলিয়াছিলেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল। তখনও পরমহংসদেব জীবিত। পরমহংসদেবের তিরোধানের এগার বৎসর পরে যে কারণেই হোক, তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ইংরাজীতে “কথামৃত” প্রকাশ করেন। প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, পরমহংসদেবের অন্ততম গৃহী-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত “তত্ত্ব-মঞ্জরী” পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে ইহা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত “নব্যভারত” পত্রিকায় ১৩০৬ “কথামৃত” ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম “কথামৃত” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।

দুঃখের বিষয় যে “নব্যভারতে”র মূল রচনা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনেক গরমিল দেখা যায় এবং পরবর্তী সংস্করণের পুস্তকগুলিতেও

(৫)

না না বিষয়ে--বিশেষতঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের অগ্রাগ্রা নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে—বহু পরম্পরবিরোধী কাল্পনিক তথ্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ও স্থানে স্থানে বহু পরিবর্তন, বর্জন ও বর্ধন করা হইয়াছে, অথচ তাহার কারণ দেখান হয় নাই।

এখন দৃষ্টান্তস্বরূপ “কথামৃত” পরম্পরবিরোধী দু’ একটি উক্তি বিচার করা যাক। “কথামৃত”র ২য় ভাগের একস্থলে শ্রীম লিখিয়াছেন : “এই সব ভাবের পর বল্লুম, মা এ সবে বিচ্ছেদ আছে। বার বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই কতদিন ‘অখণ্ড সচ্চিদানন্দ’ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি বর থেকে বার করে দিলুম। তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ ; ৯ম সংস্করণ ; পৃ: ২২১)

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রধান সহযোগী প্রত্যক্ষদর্শী ব্রহ্মানন্দ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও লিখেছেন :—

“He is an idolator, yet is faithful and most devoted meditator of the perfections of the formless, infinite Deity whom he terms “Akhandā Sachidananda.” (“Theistic Quarterly Review”—October, 1879)

বস্তুতঃ কালী ও অগ্রাগ্রা দেবদেবীর পূজা মাঝে মাঝে করিলেও পরমহংসদেব নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে প্রায়ই মগ্ন ও সমাধিস্থ হইতেন এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই বলিয়াছেন এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। স্বামী সারদানন্দও তাঁহার “লীলা প্রসঙ্গে” বলিয়াছেন যে কোন এক বৈদান্তিক সম্যাদীর নিকট পরমহংসদেব ব্রহ্মসাধনা করিয়াছিলেন। পরমহংস নিজেও বলেছেন—“আগে সাকারবাদীরা খুব আস্তো। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা

(৬)

আসতে আরম্ভ করলে। তখন প্রায়ই ঐরূপ বেঁহুস হয়ে সমাধিস্থ হতাম।” (“কথামৃত” তৃতীয় ভাগ ; ৭ম সংস্করণ ; পৃ: ৯০, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খৃ:)

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে ইহা সত্ত্বেও শ্রীম “কথামৃত”র আর এক জায়গায় পরমহংসদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—“তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন কচ্ছ, আর আনন্দ পাচ্ছ। যারা নিরাকার নিরকার ক’রে, কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ২য় ভাগ ; ৯ম সংস্করণ ; পৃ: ৪৮)

নিরূপেক্ষ ও যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে পরমহংসদেবের পক্ষে ঐরূপ উক্তি করা সম্ভবপর নহে। জনসাধারণের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজকে ও ব্রাহ্মধর্মকে অবখা হেয় প্রতিপন্ন করিবার আরো বহু দৃষ্টান্ত “কথামৃত”ে রহিয়াছে :—“শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে সহাস্ত্রে)—শুনলাম, এখানে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) নাকি সাইন বোর্ড আছে। অত্ন মতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নেই। নরেন্দ্র বলে, সমাজে গিয়ে কাজ নেই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ২য় ভাগ ; ৯ম সংস্করণ ; পৃ: ১৪৫)

অত্ন দেখা যায় :—

“গিরীন্দ্র—ব্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের faculty of organisation নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি ? মাষ্টার—আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম “এই কথা বলে।” (ঐ পৃ: ১২১)

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে যাহারা খবর রাখেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে আদি, সাধারণ ও নববিধান এই তিন ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্টডীডেই সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে যে, সেখানে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে

(৭)

সবাই ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিবার অধিকারী। “কথামৃত”কার মহেন্দ্রবাবু নিজেও এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত বনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তথাপি এইরূপ মিথ্যা অপপ্রচার করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। আর ব্রাহ্মগণ পরমহংসদেব সম্পর্কে কিরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদের পরিচালিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতেই পাওয়া যায়।

“কথামৃতে”র প্রথম ভাগের এক জায়গায় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পরমহংসদেবের মস্তব্য বিষয়ে লিখিয়াছেন :—“দেখলাম (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের) যোগ ভোগ দুইই আছে;—বলুম তুমি কলির জনক। “জনক এদিক উদিক রেখে থেয়েছিল দুধের বাটী।” তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমার ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও। তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শোনালে।—আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড় লোক।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ১ম ভাগ ; ১৬শ সংস্করণ—পৃ: ২৩৩-৪০)

প্রথম দর্শনেই মহর্ষিকে পরমহংসদেবের “কলির জনক” বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সহিত মহর্ষির কথা মিলিয়া বাওয়ার মহর্ষিকে “খুব বড় লোক” বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আবার অত্র ব্যঙ্গচ্ছলে “কথামৃতে”র ৪র্থ ভাগে শ্রীম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

“অধর—কলকাতার মধ্যে একটি জানি—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলো। —ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে। যখন সেজ বাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে—অনেক ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে

(৮)

আবার মেয়ে, সে ঈশ্বর চিন্তা না করবে তো কে করবে ? এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বর চিন্তা না করতো, লোকে বলতো ঠিক ।

নিরঞ্জন—দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বার উনি শোধ করেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রেখে দে ওসব কথা । আর জালাস্ নে । ক্ষমত' থেকেও যে বাপের দ্বার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ ?” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ৪র্থ ভাগ ; ৭ম সংস্করণ ; পৃ: ১৭৮)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধেও “কথামৃতে” এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি ও বহু তথ্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার হু'একটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল :— “যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম—‘এরই ল্যাজ খসেছে । সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো । কেশব বললে তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি । আমি বললাম.....মানুষের যতদিন অবিচার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার-জ্বলে পড়ে থাকে । অবিচার ল্যাজ খস্লে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে ।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ১ম ভাগ ; ১৬শ সংস্করণ ; পৃ: ২৩৬)

“ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদিগের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন— “কেশবের যোগ ভোগ । সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে ।” (“কথামৃত”—৪র্থ ভাগ ; ৭ম সংস্করণ ; পৃ: ২১)

আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহা সত্ত্বেও মহেন্দ্রবাবু আবার পরমহংসদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—“শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে ছিলেন । —তাই লোকশিক্ষার ব্যাঘাত হইল । ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (কেশব) বুঝেচো ?

(৯) LIBRARY
No.

বিজয়—আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদিক্ ওদিক্ ছই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু করতে পারলে না।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত”—৪র্থ ভাগ ; ৭ম সংস্করণ ; পৃঃ ১২৮)

বেলঘরিয়া “সাধন কাননে” প্রথম দর্শনেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পরমহংসদেবের “ল্যাজ থসা মুক্ত পুরুষ” বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে তিনি প্রায়ই কেশবচন্দ্রের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতে আসিতেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে অতি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে এবং প্রত্যক্ষদর্শিগণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও অকারণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা। পরমহংসদেব যে স্তরের মহাপুরুষ তাহাতে তাঁহার পক্ষে “ভাবের ঘরে চুরি” বা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে একরূপ, আবার অগ্র স্থলে আর একরূপ উক্তি করিবেন ইহা অসম্ভব। অতএব অগ্রাগ্র অসম্ভব চিত্রের ত্রাশ মহেন্দ্রবাবুর এ চিত্রও কাল্পনিক ও হীন মনোভাব প্রণোদিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ আরো অসঙ্গতি “কথামৃতে” পাওয়া যায়। “কথামৃত” ১ম ভাগের এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন :—

“শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তের প্রতি)—কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন—মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)—তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্ত আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না ? সে ঈশ্বর চিন্তা করে, হরিনাম করে।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত”—১ম ভাগ ; ১৬শ সংস্করণ ; পৃঃ ১৩৪)

ঐ একই সংস্করণের ৩৫২ পৃষ্ঠার দেখা যায় যে বরিশালের খ্যাতিনামা দেশসেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমহংসদেব তাঁহার নিকট আচার্য্য কেশবচন্দ্র “দৈবী মানুষ্য” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অথচ “কথামৃত” ৩য় ভাগে (৭ম সংস্করণ ; পৃঃ ৩০) দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন মনি মল্লিক মহাশয় দুর্গা পূজার সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের গৃহে কি ভাবে উপাসনা হইল তাহা বর্ণনা করিলেন তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি এখানে ওখানে যেও না—এইখানেই আস্বে।” যে পরমহংসদেব স্বয়ং কেশবচন্দ্রের সঙ্গ-সুখ লাভের এতই উৎসুক ছিলেন, কাণ্ডে তাঁহাকে কেশবের নিকট যাইতে বারণ করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐহাকে তিনি “দৈবী মানুষ্য” বলিয়া মনে করিতেন, সেই কেশবচন্দ্রের নিকট মনি মল্লিককে যাইতে সহসা বারণ করিবেন তাহা অসম্ভব।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মণ্ডলীর একজন প্রধান সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সাম্যাল মহাশয় (ইহার কণ্ঠের গান শুনিতে পরমহংসদেব অত্যন্ত ভালবাসিতেন) তাঁহার রচিত “কেশবচরিত” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে পূর্বে পরমহংসদেব সংসারেও ধর্ম সাধনা করা যায় এ কথা স্বীকার করিতেন না ; কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার মিলন হইবার পর এই বিশ্বাস তাঁহার পরিবর্তিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাসও সেই সাক্ষ্যই দিতেছে। কিন্তু পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দ পরে—ইহাতে পাছে গুরুর অমর্যাদা হয় মনে করিয়া “কথামৃতে”র ৩য় ভাগে (৭ম সংস্করণ ; পৃঃ ১৭৪) লিখিয়াছেন :—

“গিরীশ—তা হলে আপনি যা লিখেছেন ও কথা ঠিক না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

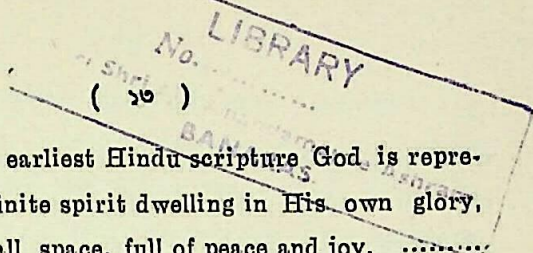
(১২)

“আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” ও “মূর্তি-পূজা” এই দুইটি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহাও ইহাদের বিবেচনায় আসে নাই। পৌরাণিক মূর্তি-পূজাকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কি ভাবে দেখিতেন এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব উক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য :—

“We do not become idolators by using these names (names of heathen gods or goddesses) with reference to the Supreme God any more than we become Jews by calling Him Jehovah, as often as we do. Nor do we become Christians by worshipping the Father of Christ, There is nothing in a name so long as we are what we are, thorough going iconoclasts and sworn foes of idolatry..... We simply transfer their homage from visible idols to the ideas they represent, thus spiritualizing the whole of their pantheon.” (*New Dispensation* December, 1881)

“কথামতে”র ৫ম ভাগে মহেন্দ্রবাবু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্মমত পরিবর্তিত হইয়াছিল—ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত *Indian Mirror* ও কেশবচন্দ্রের (*Our Faith and Experiences* 1876) নামক বক্তৃতা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ঐ জাতীয় উক্তি আচার্য্য কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেও বলিবার করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার মতবাদের মূল ভূমি ছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী *Future Church* নামক বক্তৃতাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন “Hindu's notion of God is



sublime. In the earliest Hindu scripture God is represented as the Infinite spirit dwelling in His own glory, and pervading all space, full of peace and joy.

India has religious traditions and associations, tastes and customs, peculiarly sacred and dear to her, just as every other country has, and it is idle to expect that she will forego this, nay, she cannot do so, as they are interwoven with her life."

ইংলণ্ড গমনের কিছু পূর্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী "টাইমস্‌ হলে"র বক্তৃতাতেও তিনি বলিয়াছেন—"What was India in ancient times? Her early literature and theology, metaphysics and astronomy, which have extorted the admiration of all succeeding ages, and are held in high estimation by the least antiquarians of the present day, proclaim the pre-eminent greatness of the early Hindus, and prove that they were a noble race. The venerable Rishi of ancient India sitting under the shade of his favourite tree, indulged in profound contemplations of the Deity, and enjoyed sweet communion with the Supreme One ; and he led a life of unimpeachable purity, even Hindu ladies applied themselves to theological and literary pursuits, and took part in public ceremonies and undertakings, and they have left monuments of their intelligence and devotion

which put to shame many of the boasted productions of their more refined sisters of the present day," এই ধরণের আরো বহু উক্তিই কেশবচন্দ্র করিয়াছেন ; স্মরণ্য মহেন্দ্র বাবুর রচনার বিন্দুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তাঁহারা সমস্ত কিছুই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের যে একটি বিরাট আদর্শ ছিল যাহা কেন্দ্র করিয়া তিনি তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

ইহাতেও সন্দেহ নাই হইয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পরমহংসদেবেরই একজন শিষ্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য মহেন্দ্রবাবু ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসের 'বহুমতী'তে লিখিয়াছিলেন যে কেশবচন্দ্র নাকি একদিন পরমহংসদেবকে "নবদেবালয়ে" লইয়া গিয়া সকলের অগোচরে ফুল ও চন্দন সহযোগে তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব নাকি পরে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে একথা বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যতদিন গোস্বামী মহাশয় জীবিত ছিলেন ততদিন এ কথা তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রচারিত হয় নাই। গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার কোন প্রধান শিষ্যের নিকট এই কাহিনীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই বা লিখিয়া যান নাই। মহেন্দ্রবাবু ইহাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে গোস্বামী মহাশয় মুন্দের "নরপূজা"র (১৮৬৮) আন্দোলনে প্রধান প্রতিবাদকারী ছিলেন। পরমহংসদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর পর্য্যন্তও তিনি অবতার-বাদের বিরোধী ছিলেন। (Vide :— "যোগ সাধন বিষয়ে প্রণোত্তর") স্মরণ্য কেশবচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ নরপূজার কথা অবগত হইলে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

যাহা হোক, মহেন্দ্রবাবুর এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের অন্তর্বর্তী ভাই শ্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার

প্রভুত্বের মহেন্দ্রবাবু ১৩৩২ সালের ১লা আষাঢ় এক পত্র লিখিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (“ধর্মতত্ত্ব” প্রকাশিত হয়) যে কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দের দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে পূজা করেন নাই; তবে তাঁহার (মহেন্দ্রবাবুর) বিশ্বাস কেশবচন্দ্র যেক্রপ বিজয়কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতিকে নতজান্ন হইয়া অভ্যর্থনা করিতেন, পরমহংসদেবকেও সেই ভাবেই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুমানের সপক্ষে তিনি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। অথচ আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে চিরদিনই অবতারবাদ ও গুরুপূজার বিরোধী ছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ১৮৮২ খৃঃ তিনি বলিয়াছেন:— “মহামাত্র ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগোরাৎকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহঙ্কারী বলিতে চাও, বল। দুরাচার বলিবে, তাহাও বল। কিন্তু কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না।” (“জীবনবেদ”—৮ম সংস্করণ; পৃঃ ৪৩)

এইবার আমরা স্বামী সারদানন্দ প্রণীত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” এই পুস্তকটি লইয়া আলোচনা করিব। ইহাও “কথামৃত”র দ্বায় পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরমহংসদেবের পরলোক গমনের সুদীর্ঘকাল পরে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় এবং পঞ্চম বা সর্বশেষ ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। পরমহংসদেবের অবতারত্ব ও অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই যে সারদানন্দ এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন:— “ঠাকুরের অলৌকিক ভাব সকল পাঠককে বুঝাইতে যত্ন করাই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলাম।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ”; গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ; ৩য় সংস্করণ; ভূমিকা)

স্বামী সারদানন্দ আরো বলিয়াছেন :— “যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে, তিনি ঐ সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথা সম্ভব আলোচনা করিয়াছি।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ”—৩য় সংস্করণ ; ভূমিকা)

অথচ সারদানন্দ এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে :—“আমাদিগের মন বৃদ্ধি দূরে থাকুক, কল্পনা পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করে।.....তাহার (পরমহংসদেবের) এই কালের কার্য-পরম্পরার উল্লেখ মাত্র করিয়া, উহাদিগের সফলতা দর্শনে যেটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া আমরা ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” ; ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ২য় সংস্করণ ; পৃঃ ৫)

“মনের ভাব”, “উদ্দেশ্য”, “ধারণা” ইত্যাদি শব্দগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। সুতরাং পরমহংসদেবের “লীলা” বর্ণনা করিতে গিয়া সারদানন্দ যে অনেকখানি কল্পনার সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহতে আর কোন সন্দেহ নাই। পরমহংসদেবের পরবর্তী জীবনীগুলি সম্বন্ধে সারদানন্দ বলিয়াছেন :—“ঐ অলোকসাম্রাজ্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ”—গুরুভাব পূর্বাব্দ ; ৩য় সংস্করণ : ভূমিকা)

সুতরাং “লীলা প্রসঙ্গ” গ্রন্থকার সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধন-রাজ্যের অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরিবর্তে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার, অলৌকিক গুহ্যক্ষমতাসম্পন্ন অথচ সাংগাথ সনাতনী হিন্দুরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

LIBRARY

No. 22/280

(: ৭)

“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ” (‘ঠাকুরের দিব্যভাব’ ও ‘নরেন্দ্রনাথ’) Ashra

পুস্তকে সারদানন্দ (২য় সংস্করণ; পৃ: ২) লিখিয়াছেন— “কখন কখন এমনও হইয়াছে যে, বেদী হইতে উপদেশ প্রদানকালে তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) সহসা মন্দির মধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীযুত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণে ও তাঁহার সহিত কীর্তনানন্দে সেই দিনের উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন।”

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দুইজন প্রধান শিষ্য উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন যথাক্রমে “আচার্য্য কেশবচন্দ্র” ও “পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী” নামক পুস্তকদ্বয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে পরমহংসদেব ‘কমল কুটার’ প্রভৃতি স্থানে বহুবার আসিয়াছিলেন এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্রও সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু উৎসব বা উপাসনাকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি কখনও উপস্থিত হন নাই। কেবল একদিন অপরাহ্নে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ও একজন প্রচারকের সহিত পরমহংসদেব মন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া “এখানে তিনশত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন” এই কথা উচ্চারণ করিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া সমাধিত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার তথ্যাদি হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। উপাসনার সময়ে যদি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই কোন না কোন সমসাময়িক পত্রিকায় উদ্ধৃত হইত।

বেলঘরিয়ার ‘সাধন কাননে’, ‘কমল কুটারে’, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব ও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বহুবার মিলন হইয়াছিল। দু’বার গঙ্গাবক্ষে

ষ্টীমারেও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র ভ্রমণ ও সংসঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহার সকল বিবরণই সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে উপাসনা চলিবার সময় পরমহংসদেব আসিলে কেশবচন্দ্র উপাসনা বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে অগ্রে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। উপাসনায় একবার চক্ষু বন্ধ করিয়া মগ্ন হইলে কেশবচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ করা অসম্ভব ছিল। একটি উদাহরণ দিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এক সময়ে বিলাতে তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তানায়ক স্যার জন ষ্টুয়ার্ট মিল, পূর্বাহ্নে সংবাদ না দিয়াই কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তখন স্বদেশে চিঠিপত্র লেখায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। তিনি ষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয়কে বিনীত ভাবে তাঁহার কার্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সঙ্গীণ মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে মিল সাহেব না জানি কতই অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া ধীরভাবে কেশবচন্দ্রের কার্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রচিত 'The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen'—৩য় সংস্করণ; ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সামান্য দৈনন্দিন কাজকর্মে একবার মগ্ন হইলে বিনি উহা সম্পূর্ণ না করিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না, তাঁহার পক্ষে একবার দৈবের আরাধনায় মগ্ন হইয়া উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই অত্র কাহাকেও অভ্যর্থনা করা যে কতদূর অসম্ভব ও অবাস্তব তাহা সহজেই অনুমেয়। সারদানন্দ স্বয়ং স্বচক্ষে এইরূপ কোন ঘটনা দর্শন করেন নাই, কারণ ঐ একই গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর সহিত পরমহংসদেবের

(১৯)

মিলনের মাত্র “দুইটি বিশেষ চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিবার” সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ঐ দুইটির কোনটিতেই কেশবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তখন তিনি বিশেষ অসুস্থ। সুতরাং এই উক্তি যে একেবারে কল্পিত তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

পরের পৃষ্ঠার (১১) শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন যে পরমহংসদেবের প্রভাবেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ মাতৃভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহা সত্য নহে। পরমহংসদেবের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবার বহু পূর্বে হইতেই ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবে ব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত ছিল। নিরপেক্ষ ও বক্তিনিষ্ঠ পাঠকবর্গ ইহা পূর্বে অবশ্য দেখিয়াছেন। G. C. Banerjee রচিত “Keshab Chandra and Ramkrishna” এবং শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত “পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ” নামক পুস্তক দুইটিও দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ পৃষ্ঠায় সারদানন্দ বলিয়াছেন যে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ পরমহংসদেবকে সঠিক বৃত্তিতে পারেন নাই। “লীলাপ্রসঙ্গে”র ‘সাধক ভাব’ খণ্ডের পরিশিষ্টেও তিনি এ কথা বলিয়াছেন। অথচ এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই পরমহংসে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সাধারণের গোচর করেন; এবং এই সূত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি পরমহংসের নিকট বাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁহারা traditional মনোভাবে পরমহংসকে ঈশ্বরের অবতার বা কেবল মাত্র সনাতন হিন্দুধর্মের সংরক্ষক, অলৌকিক ক্ষমতাবান মহাপুরুষ হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করেন এবং যেহেতু কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীগণ সে ভাবে তাঁহার কথা বলেন নাই—অতএব তাঁহারা পরমহংসকে চিনেন নাই এরূপ মন্তব্য করা অসঙ্গত।

(২০)

তারপর স্বামী সারদানন্দ পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া মাত্র দুইবার ব্যতীত ব্রাহ্মদিগের সহিত পরমহংসদেবের সম্মিলিত উৎসব স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই ; সেই উৎসবেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং কবে পরমহংসদেবের কোন উক্তির গভীর মর্মার্থ গ্রহণ করিতে গিয়া কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মগণ সাকার উপাসনার যৌক্তিকতা “নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন”— ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় কথিত এই তথ্য তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ”— ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ; ২য় সংস্করণ ; পৃঃ ১৫-১৮) এবং ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস হইতেই “নবীনাচার ধারণ” করিয়াছিল ; “পাশ্চাত্ত্য” বা “প্রাচ্য” কোন প্রকার অন্ধ ভাবাবেগের শ্রোতে গা ঢালিয়া দেয় নাই। তাহা গতানুগতিক অন্ধ গুরুভক্তির ভাবাবেগে আচ্ছন্ন স্বামী সারদানন্দই বুঝিতে পারেন নাই ; অথবা বুঝিয়াও বোঝেন নাই। এই অন্ধ ভাবাবেগের প্রভাব তাঁহার পুস্তকের প্রতি খণ্ডের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি পূর্বোক্ত পুস্তকের ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে পরমহংসদেবের প্রভাবেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র হোস. অভিষেক ইত্যাদি ক্রিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়াছিলেন ; বুদ্ধ, শ্রীগৌরান্দ্র, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভাবার্ণ উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের “যত মত, তত পথ” এই তত্ত্ব হইতেই কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া “নববিধান”রূপে প্রচার করিয়াছিলেন। এমন কি কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে উক্ত বিধানের “ঘনীভূত মূর্তি জানিয়া” এমনই শ্রদ্ধা করিতেন যে “জয় বিধানের জয়” বলিয়া বারংবার পরমহংসদেবের পদধূলি গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের অর্থাৎ পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে “কেহ কেহ” ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

(২১)

দুঃখের বিষয় যে এইরূপ মিথ্যা অপপ্রচার তাঁহার আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেবের জীবদশায় করিতে সাহস পান নাই, মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতেই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম পরমহংসদেবের গৃহী শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্ত তাঁহার সম্পাদিত “তত্ত্ব-মঞ্জরী” পত্রিকায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) নামে অসথা কটুক্তি করেন। নিরপেক্ষ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে অনুসন্ধান করিলে স্বামী সারদানন্দ জানিতে পারিতেন যে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাস্ত্র, ভাব ও অনুষ্ঠানের মিলন সাধন করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার সময়স্বাদের প্রসার সাধন করিতেছিলেন। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইবার সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং কেশবশিষ্যগণ কেহই তাহা অস্বীকার করেন নাই। সারদানন্দ ইহাও জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই যে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার বহু পূর্বেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র শ্রীঈশা. শ্রীগোরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ভাব সম্ভোগ করিতেছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রদত্ত ‘Jesus Christ, Europe and Asia’, Great Men ও ‘শ্রীচৈতন্য ও ভক্তিদর্শন’ নামক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমগ্র বক্তৃতা ও উপদেশাবলী—পুস্তকাকারে বাহা বহু থণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত পরমহংসদেবের উপদেশাবলী পাশাপাশি মিলাইয়া পাঠ করিলেই যে-কোন নিরপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে “নববিধান” ও “যত মত, তত পথ” এই দুই মতবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। একটি বৈজ্ঞানিক সময়বাদ; অপরটি পরমতসহিষ্ণুতা, বাহা পুরাতন মতবাদ ও

(২২)

পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক সময়বাদের প্রথম ধাপ মাত্র। নিরপেক্ষ ও যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকবর্গ—সাঁহাদের বিশদভাবে পাঠ আলোচনা করিবার অবসর নাই তাঁহারা—B. Mazoomder রচিত ‘Prof. Max Muller on Ramkrishna and the World on K. C. Sen’; ‘Mohayogi Keshab and Europe’; G. C. Banerjee রচিত ‘Keshab Chandra and Ramkrishna’ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ” ইত্যাদি গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত গঠন করুন। এমন কি প্রথম অপপ্রচারক শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার পত্রিকায় স্বীকার করিয়াছেন— “সাঁহারা পরমহংসদেবকে ‘নববিধান’ের প্রবর্তন কর্তা বলিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের ইহাই বলিতে চাহি যে তাহা তাঁহাদের বৃথিবার ভুল হইয়াছে।” (“তত্ত্ব-মঞ্জরী”—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)

পরমহংসদেবের অন্ততম গৃহীশিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার “কথামৃত”র ২য় ভাগে বলিয়াছেন—

“শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) কে জানে বাপু, আমি কিন্তু ‘নববিধান’ মানে জানি না (সকলের হাস্য)।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত”, ২য় ভাগ ; ৯ম সংস্করণ ; পৃঃ ১১৯ ।)

কেশবচন্দ্র যদি “বিধানের জয়” বলিয়া পরমহংসদেবের পদধূলি গ্রহণ বা প্রণাম করিয়াও থাকেন তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে তিনি পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন বা “নববিধান” পরমহংসদেবের মতবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কে না জানে যে প্রণাম বা পদধূলি গ্রহণ আমাদের দেশে শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচার জ্ঞাপনের একটি পন্থা মাত্র ? পরমহংসদেবও তো “আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম” বলিয়া ভূমিতে শির স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মদের প্রণাম জানাইয়াছেন ; কেশবচন্দ্রকেও তিনি

(২৩)

দেখা হইলেই এভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন (১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২ই অক্টোবরের "Indian Mirror" দ্রষ্টব্য) এ জগৎ তাঁহাকে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মদিগের শিষ্য বলা যায় না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার মহাশয় বলিয়াছেন :—

"Such bickering and cavilling would have been most distasteful both to Keshab Chandra Sen and to Ramkrishna. Both had no words but words of praise and love for each other and it was a great pity that their mutual relations should have been treated in a jealous way, and thereby totally misrepresented. ...If my words could possibly have been misunderstood in India, I gladly state that neither did Ramkrishna act as Guru nor Keshab Chandra Sen as Sishya. ("Ramkrishna ; His life and sayings" 1951 ed. P. 67)

Romain Rolland ও ইহাদের প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া নিজ পুস্তকে ভুল করেন। পরে ঐ ভুল কি ভাবে স্বীকার করেন তাহা তাঁহার এই পত্র হইতে বুঝা যায় :—

(Translation)

VILLENEUVE (Vaud),

VILLA OLGA, SWITZERLAND,

3rd January, 1932.

Dear Mr. Banerji,

I thank you profusely for your book on 'Keshab-chandra and Ramkrishna', which you have sent me. It

(২৪)

settles, in a definite way, certain points, which remained obscure, in the relations between the two great Souls ; and it (your book) gives me at last, an exact chronology of the work and activities of Keshab. I regret in not having knowledge of those things, before writing my work, for otherwise I could have avoided certain errors, which I shall try my best to rectify later on.

I should assure you, however, that in scenes like that of the meeting of the dying Keshab with Ramkrishna, I have not seen (and no European will see) in the act of Keshab's salutation to Ramkrishna, a gesture of religious adoration. It was only a simple sign of affectionate respect which appears to us as infinitely touching and which makes us love Keshab all the more for that.

Believe me in my devoted sympathy.

ROMAIN ROLLAND.

অন্ধ গুরুভক্তির ভাবাবেগের বজ্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সারদানন্দ “লালা প্রসঙ্গে”র (২য় সংস্করণ) ২৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে প্রতাপচন্দ্র প্রভুদাস নাকি কোন এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদের নিকট বলিয়াছিলেন—“ইহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্ম কাহাকে বলে তাহা কি বুঝিতাম? কেবল গুণামি করিয়া বেড়াইতাম। ইহার দর্শন লাভের পরে বুঝিয়াছি ষথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।”

সারদানন্দ বলিয়াছেন, যে দিন প্রতাপচন্দ্র ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, সেই দিন ত্রৈলোক্যনাথ সাম্মাণ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু

সান্যালমহাশয় তাঁহার কোন পুস্তকে বা কোন বনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট এইরূপ কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেবের শোকান্তর গমনের পর রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ তাঁহার কয়েকজন গৃহীশিষ্যের অপপ্রচার লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'Interpreter' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

"He (Ramkrishna) did not bring the idea (God as our Mother) into the Church it was there before Minister's acquaintance with him. But he by his childlike bhakti, by his strong conception of an ever-ready motherhood, helped to unfold it in our minds wonderfully..... By associating with him we learnt better divine attributes as scattered over 330 millions of Deities of mythological India, the gods of the Puranas. By associating with us he learnt to realize better the undivided Deity, the God of the Upanishads, the Akhanda Sachchidananda." ('Interpreter' Sept., 1886)

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৭৪ খৃঃ ইউরোপেও ধর্ম্মনেতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিলেন !! পরমহংসদেব ধর্ম্মনেতা কেশবচন্দ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ১৮৭৫ খৃঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জগ্ন বেলঘরিয়া তপোবনে আসিয়াছিলেন !! দল খাড়া করিতে গিয়া মানুষ্য কিরূপ বিচার-বুদ্ধিহীন হইয়া পড়ে সারদানন্দের এই উক্তি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের ব্রহ্মসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন— "কিন্তু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানা

(২৬)

প্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনার সমর্থ হইয়াছেন।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ) ; পৃ: ২৫)

কিন্তু কি ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন বা তাঁহার এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সারদানন্দ দিতে পারেন নাই। অথচ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপাসনার সময় সেই ভাবে ভাবিত হইয়া যে তিনি অনেক হৃদয় হৃদয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে প্রকাশিত “ব্রহ্মসঙ্গীত” পুস্তকে তাঁহার রচিত অনেকগুলি মাতৃভাবোদ্দীপক সঙ্গীত দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্যাল মহাশয় যদি পরমহংসদেবের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে কোন মাতৃভাবাত্মক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা না করিতেন তাহা হইলে সারদানন্দের উক্তি কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হইত। পরমহংসদেবের উপদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঐরূপ ভাবাত্মক কোন সঙ্গীত রচনা করিতে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন একথাও সারদানন্দ বলিতে পারেন নাই; কারণ আদৌ ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

মহেন্দ্রবাবু রচিত “কথামৃত”র ২য় ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও পরমহংসদেবকে ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু পরমহংসদেব উহার সহিত তাঁহার নাম জড়িত করিতে বারণ করিয়াছিলেন। (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ২য় ভাগ; ২য় সংস্করণ; পৃ: ১২১) মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃ সারদানন্দও “লীলাপ্রসঙ্গে”র ‘সাধক ভাব’ খণ্ডের পরিশিষ্টে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কত্বে গোপনে পরমহংসদেবের পাদপূজার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অযৌক্তিকতা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

(২৭)

সারদানন্দ বলিয়াছেন (পৃ: ১২) যে পরমহংসদেবের প্রভাবেই শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পরিবর্তিত হয় ও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অথচ ১২৯৩ সালের শেষভাগে (পরমহংসদেবের পরলোক গমনের পর) প্রকাশিত “যোগ-সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর” নামক পুস্তকে স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার ধর্মজীবনের আরম্ভ, পরিণতি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে যে স্তম্ভের বিবরণ দিয়াছেন তাহার কোথাও পরমহংসদেবের কোন প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী জীবনেও শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ যে সাতজন মহাপুরুষকে তাঁহার ধর্মপথ প্রদর্শক বলিয়া উল্লেখ করিতেন তাহার মধ্যে পরমহংসদেবের নাম ছিল না।

অত্যধিক কঠোর সাধন ভজনের ফলে পরমহংসদেবের স্নায়বিক বিকার হইয়াছিল এবং সেই জন্য তিনি প্রায়ই মূচ্ছিত হইয়া পড়িতেন ; এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। “ইচ্ছা হয় সর্বদা বিভ্রাণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ‘ধর্মতত্ত্ব’ ১৪ই মে ১৮৭৫ খৃঃ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত “কথামৃত”ও দেখিতে পাওয়া যায়—

ডাক্তার—তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)—“আমি কি করবো ? সেই অবস্থা এলে বেঁচস হয়ে যাই। কি করি কিছুই জানতে পারি না।” (“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” ১ম ভাগ ; ১৬শ সংস্করণ ; পৃ: ৭৫)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পরমহংসদেব এ কথা বলিলেন না যে তখন তিনি ঈশ্বরের ধ্যান-মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হন। শুধু ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার নহেন, তৎকালীন বিখ্যাত Civil Surgeon Dr. Macdonald সাহেবও তাঁহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া স্নায়বিক বিকার ও মূচ্ছা

রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছিলেন। (ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের ডায়েরী ও বি, মজুমদার রচিত “Prof. Max Muller on Ramkrishna & the World on Keshab Chandra Sen” দ্রষ্টব্য)। সাধন-ভজনের ফলে শারীরিক রোগাক্রান্ত হইলেই মহত্ব বা ধার্মিকতা চলিয়া যাইবে এই অদ্ভুত ধারণাই বা স্বামী সারদানন্দের কেন জন্মাইল তাহা বোঝা দুঃসাধ্য।

সারদানন্দ আরও বলিয়াছেন যে পরমহংসদেবের প্রভাবে ব্রাহ্মসংঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। “নীলাগ্রসঙ্গ” (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্র নাথ; ২য় সংস্করণ; পৃ: ২৩) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ‘Modern Review’ পত্রিকায় পরমহংসদেব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (যাহা পরে তাঁহার রচিত ‘Men I Have Seen’ নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে) তাহাতে সরলভাবে পরবর্তীকালে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট না যাওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাঁহার (পরমহংসদেবের) শেষ জীবনে তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর্যাবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেন; তাঁহাদের সহিত অবস্থা বাকবিতণ্ডা এবং থিয়েটারের নট-নটীগণের (যাঁহারা তখন পরমহংসদেবের নিকট যাওয়া আসা আরম্ভ করিয়াছিলেন) সঙ্গ পরিহার করিবার জন্যই তিনি (শাস্ত্রী মহাশয়) যাওয়া আসা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের রোগশয্যায় শেষ সাক্ষাতের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী এ কথা তাঁহাকে সরলভাবে খুলিয়া বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অতএব দেখা গেল যে অগ্রান্ত বহু অল্পমানের ঠায় সারদানন্দের এই অনুমানও যথার্থ নহে। পরমহংসদেবও শাস্ত্রী মহাশয়কে স্পষ্টই

বলিয়াছিলেন যে “ঈশ্বর কখনও গলার ঘায়ে মরে না”
“লীলাপ্রসঙ্গে” (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ) ১৪৭-৫০ পৃষ্ঠা ।

সারদানন্দ বলিয়াছেন, এক সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বহুদিন দেখিতে না পাইয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিবার জন্ত কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ব্রাহ্মদের মধ্যে গাহারা তাঁহাকে দেখেন নাই তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেঞ্চির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন । ইহাতে সমাজ-মন্দিরে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল এবং আচার্য্য উপাসনা বন্ধ করিয়া শুক হইয়া রহিলেন । নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি পরমহংস-দেবের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । সমাজের আচার্য্য বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেদিন পরমহংসদেবকে কোনরূপ অভ্যর্থনা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন না । ক্রমে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়াতে কর্তৃপক্ষ মন্দিরের গ্যাসালোক নিভাইয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাতে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পাইল । তখন নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সমাজ-মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার দিয়া পরমহংসদেবকে বাহিরে আনিয়া গাড়ীতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিলেন !!

কোন আচার্য্য সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন তাহা সারদানন্দ উল্লেখ করেন নাই । ব্রাহ্মসমাজে চক্ষু বন্ধ করিয়া উপাসনা করা হয়, সেই সময় আচার্য্য বা উপাসকদিগের পক্ষে অন্য কাহাকে অভ্যর্থনা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে যাওয়া বা কৌতুহলীরূপে বেঞ্চে দাঁড়ানো অসম্ভব ও নিয়ম-বিগত । তা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বারে কোন বড় রাস্তা নাই । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার

(৩০)

“কথামৃত”র কোন খণ্ডে এইরূপ কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাতেও (“তত্ত্ব-কৌমুদী” বা “Indian Messenger”) এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার কোন পত্রে বা বক্তৃতায় এইরূপ কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই।

যত দিন বাইতেছে এইরূপ কল্পিত কাহিনীর সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে আবার এক পুস্তকে আর এক পুস্তকের বিরুদ্ধ কথাও দেখা যায়। সে সময়ে শ্রীমহিমাচরণ চক্রবর্তী নামে জনৈক সাধক মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের নিকট আসিতেন। সারদানন্দ তাঁহার “লীলাপ্রসঙ্গে” (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ; ২য় সংস্করণ ; পৃ: ৩৭১) চক্রবর্তী মহাশয়কে অহঙ্কারী, লোভী ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “কথামৃত” দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমের প্রতি)—“এগিয়ে পড়। আরও যাও, চন্দন কাঠ পাবে, আরও আগে যাও রূপার খনি পাবে.....এগিয়ে পড়।”

মহিম—“আজ্ঞে, টেনে রাখে যে,—এগুতে দেয় না” (“কথামৃত” ২য় ভাগ ; ১ম সংস্করণ ; পৃ: ২৩৪),,

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—“মহাশয় সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ?”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমের প্রতি. একান্তে)—তোমার একলা একলা বোল্‌বো ; তুমিই এ কথা শোন্‌বার উপযুক্ত।” (“কথামৃত” ২য় ভাগ ১ম সংস্করণ পৃ: ২৪৭)

সারদানন্দ বর্ণিত চিত্রানুযায়ী মহিমাচরণ যদি সত্যিই লোভী ও অহঙ্কারী হইতেন, তাহা হইলে পরমহংসদেব কি তাঁহার সহিত ঐরূপ ভাবে কথোপকথন করিতেন ? কাহার বর্ণনা আমরা বিশ্বাস যোগ্য

(৩১)

বলিয়া গ্রহণ করিব ? মহেন্দ্রবাবুর, না সারদানন্দে ?

শ্রদ্ধাপদ প্রতাপচন্দ্র যজ্ঞদার মহাশয়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিব।

“The excellent individual who reports the late Sree Ramkrishna Paramhansa is typical devotee and disciple. We read his reports where ever whenever we reach these, and are always interested. We were personally present and took part in many of the conversations and do not think they are always accurately reproduced. But it seems this excellent reporter could not have been present at all the conversations. It is specially obvious when the talk turns out to be between the Paramhansa and Keshab Chandra Sen. Keshab always learnt from anyone who had any message to give.....and he had the deepest respect for Ramkrishna but it is strange and comical for Ramkrishna's disciples to represent Keshab as a fellow-disciple of theirs, and to represent the Paramhansa as laying down the law for his guidance. We have nothing but respectful affection for the memory of the Paramhansa ; but the Divine perfection devotees thoughtlessly impute to him harms his name and forces us sometimes to speak the sober truth.”
(*Interpreter*, 1901).

(৩২)

শ্রদ্ধান্বেষ প্রতাপচন্দ্রের বিশেষ সমর্থনে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতিনিধি রূপে বক্তৃতা দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কিছুটা সাময়িক খ্যাতি অর্জন করিলেও, আমেরিকার সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর তিনি যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা তাঁহার নিজ স্বীকৃতি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় :—

“Now lecturing for a year in this country (America) I could not succeed at all (of course, I have no want for myself) in my plan of raising some funds for settling up my work” (“Letters of Swami Vivekananda” —4th ed.—P. 398).

“যে প্রস্তাবগুলি সভায় (মাস্ত্রাজের) পাশ হয়েছে, সে গুলি ধর্ম মহাসভার সভাপতি, চিকাগো, ডাঃ জে, এইচ, ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ করবে যে ঐ প্রস্তাব ও পত্রগুলো যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে গোণ দস্তর-মাক্ষিক পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রমুখ প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাতে দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটি নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হবে। যদি কলকাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে এই রকম সব আসে তা হলে আমেরিকানরা যাকে বলে Boom তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজুকে মেতে যাবে) আর যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াক্সিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা গাঁট থেকে পয়সা বের করবে।” (১১ই জুলাই ১৮৯৪ আলাসিঙ্গাকে লিখিত বিবেকানন্দের পত্র ; “পত্রাবলী” ১ম ভাগ ১৩৫৫, পৃ: ২০১-২)।

(৩৩)

“এদের হিন্দু হতে বল্লে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘৃণা করবে ; যেমন আমরা খ্রীষ্ট মিশনারীদের ঘৃণা করি। তবে হিন্দুশাস্ত্রের কতক ভাব এরা ভালবাসে এই পর্য্যন্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে।” (“পত্রাবলী” ১ম ভাগ ১৩৪৫, পৃঃ ৩১১)।

Now York Critique গ্রন্থে কোন কোন সংবাদ পত্রে বিবেকানন্দের চেষ্টার অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রকাশিত হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে ভারতে তদন্তরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমেরিকার তৎকালীন সংবাদপত্র জগতে যে ঐ জাতীয় বিবিধ অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রকাশ করা চলিত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়।

“আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুশী তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বারো আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিষ পুরণ করে নেয়।” (“পত্রাবলী” ১ম ভাগ ; ১৩৫৫, পৃঃ ৩৫২, চিকাগো হইতে জি, জি, কে লিখিত বিবেকানন্দের পত্র)।

“যা হোক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আর আমি তোমাদের নিকট ওগুলি পাঠাবো আশা কোর না। কাজ আরম্ভ হওয়ার জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে।” (“পত্রাবলী” ১ম ভাগ ; ১৩৫৫ পৃঃ ৩৪৬-৪৭, ঐ)।

স্বামী বিবেকানন্দ তথায় নিজের নাম, পরমহংসদেবের নাম ও আদর্শ প্রচার করিবার জন্য কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় ও দেখা যায় যে ইহাতে হুজুগ হইয়াছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাই তখন আরেক পথ অবলম্বন করেন, শ্রদ্ধাম্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার Theistic Quarterly Review তে

PRESENTED

(৩৪)

পরমহংস বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া ব্যবহার আরম্ভ করেন—“ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উদ্বোধন প্রকাশিত খানকতক চিকাগোর পাঠাতে পার ? কলিকাতায় অনেক আছে।” (“পত্রাবলী” ১ম ভাগ ; ১৩৫৫, পৃ: ১২৬ ; ২২শে জুন ১৮৯৪ জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখিত পত্র)।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিলেন কেন ? কারণ তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের অসামান্য প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মসমাজেরও আদর । প্রতাপচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ পূর্বক ব্রাহ্মসমাজের উদার ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দি করিয়া, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভাতেও ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়া উক্ত মহাসভায় যে বক্তৃতা দি দেন তাহাতে আমেরিকাবাসীদের এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে তাঁহারা মজুমদার মহাশয়কে বোষ্টনের বিখ্যাত Lowell Institute এ ভারতবর্ষ ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্ত বিশেষ ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া “Prophet of the Glowing East” নামে ভূষিত করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা বিশেষ উত্তোগী হইয়া “Mozoomdar Mission Fund” সংগঠন করিয়া ভারতে ও বিদেশে প্রতাপচন্দ্রের প্রচার কার্য্যের জন্ত অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

এ দেশে তখন তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ক্রমাগতঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করিতে থাকিলে তিনি তাঁহাদের ভৎসনা করিয়াছিলেন :—

“On the other hand my brethren foolishly talk nonsense about Keshab Chandra Sen and Madrasis telling the—anything I write about them, are creating only enemies. Oh ! If only I had one man of some true abilities, and brains to back me in India ! But His will be done. I stand a fraud in this country.”
(“Complete Works of Swami Vivekananda” Vol VIII—1951-P. 320).

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দের এই পত্রটির বঙ্গানুবাদে নূতন শব্দ যোগ করিয়া উহার অর্থের বিকৃতি করা হইয়াছে !! (“পত্রাবলী” ১ম ভাগ, ১৩৫৫ পৃ: ১৯৩) নিরপেক্ষ ও যুক্তিনিষ্ঠ পাঠক বর্গই বিচার করিয়া স্থির করিবেন যে তাঁহাদের এই কার্য্য কতখানি “ন্যায় সঙ্গত” হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রথম দিকে গুরুভ্রাতাদিগকে ভৎসনা করিলেও বিবেকানন্দ পরে নিজেই মন পরিবর্তন করিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেবের ভিতর কে বড় কে ছোট সে বিষয়ে মনগড়া সংবাদ প্রদান করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ‘নাইটিংহাম সেক্সুয়ী’ পত্রিকায় ‘A Real Mahatman’ নামে পরমহংসদেব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ‘My Master’ বক্তৃতায় এই প্রবন্ধটি ব্যবহার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে পাশ্চাত্য জগতের মনিষীদিগের নিকট পরিচিত করেন। ব্রাহ্মগণ এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ করেন। ম্যাক্সমুলার তখন বিবেকানন্দ ও মাদ্রাজ “রামকৃষ্ণ সংঘের” মুখপত্র “ব্রহ্মবাদিন্” পত্রিকার সম্পাদকের নিকট

পরমহংসদেব সম্বন্ধে এবং তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে সাফাৎ ভাবে পরমহংসদেব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'Ramkrishna ; His Life and Sayings' প্রকাশ করেন ও পূর্বে প্রবন্ধের দোষ স্বীকার করেন। প্রতাপচন্দ্র প্রদত্ত তথ্য সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন :—

"Mazumder must be counted as a favourable witness. He stands aloof from the propoganda carried on by Ramkrishna's disciples, but he speaks of him in the highest terms." ("Ramkrishna ; His Life and Saying" by Maxmuller—1931 ed P. 61-62).

স্বামী বিবেকানন্দ দেখা যায় চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার পর (১৮৯৪) হইতেই শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার কয়েকটি কারণও দেখা যায় :— ১ম কারণ ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন চলিবার সময় তিনি চিকাগোর হোটেলে "বীফ্" ইত্যাদি সকল প্রকার ঐ দেশীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতেন এবং নানা শ্রেণীর মহিলাবৃন্দের সহিত, এমন কি থিয়েটারের নটাদিগের সহিত মিশিয়া (স্ত্রীমতী বিজেন রো'স রচিত নিবেদিতা জীবনী দ্রষ্টব্য) তাহাদের মধ্যেও ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেন। মহোচ্চ নীতি ও রুচি সম্পন্ন মজুমদার মহাশয় ইহা পছন্দ করেন নাই এবং বয়ঃ কনিষ্ঠ বিবেকানন্দকে যথার্থ ভারতীয় সন্ন্যাসীর ন্যায় স্বাঙ্গিক ভাবে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিবেকানন্দ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ২য় কারণ ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশনের পর বোষ্টন, প্রভৃতি আমেরিকার প্রধান প্রধান শহরে যখন প্রতাপচন্দ্র বক্তৃতা দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে তাঁহাকে "হিন্দু সন্ন্যাসী"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনিও সরলভাবে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহাই বলিয়াছিলেন, কোনরূপ অতিরঞ্জিত তথ্য প্রদান করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি তাঁহাদের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার সহিত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আত্মজীবনীতে প্রদত্ত বিবৃতি ও স্বামী সারদানন্দ রচিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে” বর্ণিত (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ) বিবেকানন্দের পূর্বজীবনের কোনই প্রভেদ ছিল না। অথচ তাঁহার বিবৃতিতে বিবেকানন্দ মনে করিয়াছিলেন যে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার “মহত্ব”কে ধর্ম করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে “ঘড়ঘড়” করিতেছিলেন!! ৩য় কারণ :— ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রতাপচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে অনেকে তাঁহাকে আমেরিকায় বিবেকানন্দের কার্য্য কলাপ ও প্রভাব সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশংসার উত্তরে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কোন কোন দেশী বিদেশী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত অতিরঞ্জিত বিবৃতির সহিত মেলে নাই। ইহা ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ কোন কোন গুরুভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উক্তির কদর্থ করিয়া আমেরিকায় বিবেকানন্দকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে বিবেকানন্দ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ৪র্থ কারণ :—অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কর্তৃক আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের উপর অধিকতর আস্থা জ্ঞাপনও ক্ষোভের কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অগ্ন্যান্ত কর্তৃক কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মিথ্যা অপপ্রচার হইত তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইয়া প্রতাপচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত *Interpreter* পত্রিকায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

"It is a surprise to us to see the almost worldwide quotations that are made from the estimate we published of the Paramhansa in the 'Theistic Quarterly Review' nearly twenty years ago; it is equally a surprise to us to find the almost unmitigated ill-feeling shown to us by the Paramhansa's followers for the extensive introduction which our writing has given to their Guru. And now instead of feeling gratitude towards the leaders of the Brahmo Somaj for the service thus done, the followers of Ramkrishna try to make out that Keshab Chandra Sen borrowed the very New Dispensation from the man whom he introduced to the public." (*Interpreter*—October—1896).

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত পরমহংসদেবের বৃহৎ জীবনী ও উক্তি প্রকাশিত হইলে উহার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

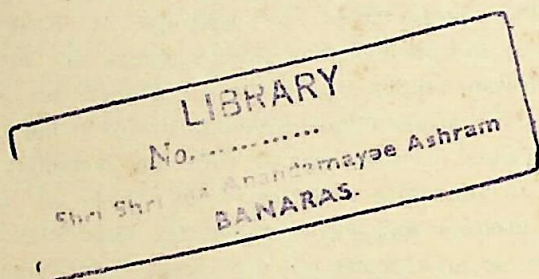
"And now from the advocacy of Hindu principles he (Max Muller) has come to the advocacy of Hindu personalities. He has boldly expressed his honor for Raja Ram Mohan Roy; Keshab Chandra Sen; Dayananda Saraswati; Debendra Nath Tagore and others, whenever he had opportunities, and now he has written a book on Paramhansa Ramkrishna. The book is full of the most generous appreciation of the saint of Dakshineswar. We are truly pleased at this.

Yet it would be dishonest on our part to conceal the fact that there are certain things said in the book with which it is impossible to agree. We may account for this by the fact that foreigners even a friendly and

generous foreigner like Max Muller, inevitably fall into certain misconceptions which nothing but actual, close personal observation can prevent. ... In the present instance the author says he has written from materials furnished by the well-known Mr. Vivekananda, Ramkrishna's professed disciple. Professor Max Muller has now and then quoted from the writings of Keshab Chandra Sen, and some of our own writings to establish his position, and we do not at all grudge this, on the contrary feel pleased that he should do so. For in fact Keshab's and our own relation with the Paramhansa were prior to and quite as intimate as those of his so-called disciples, and we do not in the least wish to be set down as antagonists of the great saint whom we delighted to love and honor." (*Interpreter*—February—1899).

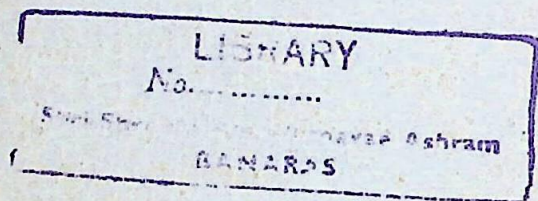
পরমহংস রামকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর ভক্তেরা যে সব রচনার উপর প্রধানত নির্ভর করেন তাহার চারিটি (১) শ্রীরামচন্দ্র দত্তের “তত্ত্বমঞ্জরী” (২) শ্রীম “কথিত” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, (৩) স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও “পত্রাবলী”, (৪) স্বামী সারদানন্দ রচিত “শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” বিষয়েই আলোচনা করা হইল এবং অসঙ্গতি দেখান হইল। আশা করি সত্যাত্মবোধী পাঠকেরা এই সকল বিষয় বিচার করিয়া সন্দেহ স্থির করিবেন।

PRESENTED



ভ্রম—সংশোধন

- পৃ: ২৯ দ্বিতীয় লাইনে “নীলা প্রসঙ্গ” না হইয়া “Men
I have Seen” By S. N. Sashtri.
Pg. 79-80 হইবে।
- পৃ: ৩৪ বাইশ লাইনে ‘তিনি’ না হইয়া ‘বিবেকানন্দ’ হইবে।
- পৃ: ৩৬ দশম লাইনে 1931 না হইয়া 1951 হইবে।
এগার লাইনে ১৮৯৪ না হইয়া ১৮৯৩ হইবে।
সতের লাইনে বিজেন না হইয়া লিজেল হইবে।
- পৃ: ৩৭ তেইশ লাইনে ১৮৮৬ না হইয়া ১৮৯৬ হইবে।



PRESENTED